বর্ণান্ধ

দুষ্প্রাপ্য বইখানাকে বগলে গুঁজে পুরনো বইয়ের দোকানের ভ্যাপসা মলিন পরিবেশ থেকে আমি বাইরের রাস্তায় বেরিয়ে এলাম। অগস্ট মাস। বিষণ্ণ গুমোট সন্ধেগুলি যেন এই সময়ে একটা ভারী বোঝার মতো মানুষের বুকের উপরে চেপে বসে। কিন্তু বাড়ির পথে বেশ ফুর্তি নিয়েই হাঁটছিলাম আমি। আগের দিন আমার মনটা বিশেষ ভাল ছিল না। বুঝতে পারছিলাম যে, ইতিমধ্যে সেই মনমরা ভাবটাও দিব্যি কেটে গেছে। কেনই বা কাটবে না ? কপাল ভাল বলতে হবে, পুরনো বইয়ের দোকানে ঢুকে তাকের ধুলো ঘাঁটতে-ঘাঁটতে একেবারে হঠাৎই এমন একটি রত্ন পেয়ে গেছি, যার খোঁজ পেলে যে-কোনও রসিক ব্যক্তির জিভ দিয়ে জল ঝরবে। রত্নটি আর কিছুই নয়, চিনের মৃৎশিল্প নিয়ে ফরাসি ভাষায় লেখা দুষ্প্রাপ্য একখানা গবেষণাগ্রন্থ। মোটা বই, ছবিগুলোও চমৎকার। তার উপরে আবার বইখানা পেয়েও গেছি একেবারে জলের দরে। এ-সব বই যারা বেচে, কী বেচছে তাও কি তারা জানে না ?

আপাতত এই বইয়ের মধ্যে যে হপ্তা দুয়েক ডুবে থাকা যাবে, এই কথাটা ভাবতে-ভাবতে রোজকার মতো আজও আমি পোস্ট আপিসের কাছে মোড় ফিরেছিলাম। কোনও কিছু ভাবতে ভাবতে যারা হাঁটে, তাদের ত আর অন্য-কোনও দিকে খেয়াল থাকে না, আমারও ছিল না। ফুটপাথে চোখ রেখেই হাঁটছিলাম আমি। তবে কিনা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলেও ত একটা ব্যাপার আছে, সেটা নিশ্চয়ই কাজ করছিল, তা নইলে আর মাথা নিচু করে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ কেন চোখ তুলে তাকাব। তাকিয়ে দেখলাম, আমার থেকে কয়েক গজ আগে আর-একটা লোক খুবই মন্থর গতিতে, যেন বা পা টেনে-টেনে হাঁটছে। আর-একটু নজর করে দেখে মনে হল, লোকটা হয়তো একেবারে অচেনাও নয়। ঝুঁকে পড়ে হাঁটার এই ভঙ্গিটা আমি চিনি। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুও ঠিক এইভাবেই হাঁটত। কিন্তু সেই বন্ধুটির সঙ্গে ত বছর দশেক হল কোনও যোগাযোগই আমার নেই। লোকটি সত্যিই আমার সেই বন্ধু কি না, সে-বিষয়ে নিশ্চিত হবার জন্যে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আমি তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম।

হ্যাঁ, দীর্ঘকাল যার সঙ্গে কোনও যোগাযোগ ছিল না, সেই বন্ধুটিই বটে। চেহারা আর সেই আগের মতো নেই, শরীর একেবারেই ভেঙে গেছে, তবে চেনা যায়। কাঁধে হাত রাখতে সে চমকে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। কী ভীষণ পালটে গেছে আমার বন্ধুটি, এ ত ভাবাই যায় না! আগে তাকে যা দেখেছি, এখন সে যেন তার ছায়া মাত্র। আমাকে দেখে আবেগে সে কথাই বলতে পারছিল না। আমার অবস্থাও তথৈবচ। কাছেই একটা চায়ের দোকান। বন্ধুটিকে টেনে নিয়ে আমি সেই দোকানের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। তারপর এমন একটা কোণ বেছে নিয়ে সেখানে গিয়ে বসলাম, যেখানে আলো তত জোরালো নয় আর পরিবেশটাও একটু নিরিবিলি। আমাদের কারও মুখেই কোনও কথা সরছিল না।

চা খেতে-খেতে অতীতের কথা মনে পড়ল আমার।

একই ইস্কুলে পড়তাম আমরা। তারপর একই কলেজে। সেই সময়েই যে আমরা পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম, তার কারণ আমরা দুজনেই ছিলাম শিল্পপ্রেমিক। যখন আমরা কলেজের ছাত্র, তখনই দেখতাম যে, ক্যানভাসের উপরে রঙের তুলি বুলোতে বুলোতে কত অনায়াসে সে একটার পর একটা আশ্চর্য ছবি তৈরি করে তোলে। আমি ছিলাম তার সমালোচক। নির্ভীক, নিরপেক্ষ সমালোচক। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তার ছবিগুলিকে দেখতাম আমি, তারপর যা মনে হত, খোলাখুলি বলতাম। রঙের ব্যবহারে তার দক্ষতা ছিল অসাধারণ, মনে হত সে যেন রঙের জাদুকর। পুরো ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে, যেন সে-সব গ্রাহ্যের মধ্যে না এনেই এমন নির্লিপ্ত অথচ নিশ্চিত ভঙ্গিতে সে ক্যানভাসের উপরে রং চড়িয়ে যেত যে, আমি অবাক হয়ে যেতাম। অথচ প্রতিটি ক্ষেত্রে তার পুরো কাজটাও হত অসাধারণ।

কিন্তু—এবং এই 'কিন্তু'টা খুবই তাৎপর্যময়—এ-কালের তাবৎ প্রগতিশীল তরুণ বুদ্ধিজীবীর মতো সেও ছিল 'বামপন্থী'। আর শিল্পের ক্ষেত্রে বামপন্থী হওয়ার যে পরিণাম, তার বেলাতেও তার কোনও ব্যতিক্রম হয়নি। এখানে তখন আয়েসি রক্ষণশীলরাই ত দলে ভারী, তাদের কাছে সে একেবারে অচ্ছুত হয়ে গেল। এটা কোনও আশ্চর্য ব্যাপার নয়, এ-রকম যে হবে, তা ত জানাই ছিল, ব্যাপারটাকে সে তাই ধর্তব্যের মধ্যে আনল না, এটাকে পুরোপুরি উপেক্ষা করে সে এঁকে যেতে লাগল তার ছবি। একমাত্র আমিই জানি যে, এর পর থেকে অ্যাকাডেমির নামগন্ধও সে সহ্য করতে পারত না।

শিল্পের ব্যাপারে তার প্রগতিশীল মতামতগুলি কিন্তু আমি খুবই সমর্থন করতাম। তার কারণ আমিও এ-ক্ষেত্রে ছিলাম পুরোপুরি 'আধুনিক'।

তার তাবৎ ছবির পিছনে যে একটা সজীব মন কাজ করে যাচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারতাম। বুঝে খুশিও হতাম খুব। আমার মনে পড়ে যে, একবার সে তার ছবির এক প্রকাশ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল। কিন্তু দর্শক একেবারেই না-আসায় সেটা খুবই করুণ একটা তামাশার ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। তারও পুরোপুরি মোহভঙ্গ হয়। সে বুঝতে পারে যে, সাধারণ দর্শকসমাজের শিল্পবুদ্ধি এখনও অতি নিচু স্তরে আটকে আছে, তার উপরে আর উঠতে পারছে না। এর পর থেকে সে তার স্টুডিয়োর মধ্যেই প্রদর্শনীর আয়োজন করত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যেত যে, একমাত্র আমিই তার দর্শক, আমিই তার সমালোচক।

সে শিল্পী আর আমি তার শিল্পের অনুরাগী। যেন পরস্পরের পরিপূরক আমরা দুজনে। এইভাবে আমাদের জীবন নেহাত মন্দ কাটছিল না। টাকা রোজগারের কোনও গরজ ছিল না তার। বাবা ছিলেন বিখ্যাত ব্যবসায়ী, ছেলের জন্যে বিস্তর টাকাকড়ি তিনি রেখে গেছেন, সুতরাং ছবি এঁকে টাকা রোজগার করতে হবে এমন কথা তাকে ভাবতে হয়নি, আর তাই আর্ট ফর আর্ট'স সেক অর্থাৎ কলাকৈবল্যের সাধক হয়েই দিব্যি সে দিন কাটাতে পারছিল। আমার অবস্থা অন্য রকম, যে-কলেজে পড়তাম, গ্র্যাজুয়েট হবার পরে সেখানেই আমি লাইব্রেরিয়ানের চাকরিটা পেয়ে যাই। খুব-একটা ভাল চাকরি নয়। কিন্তু তা না-ই হোক, আমার শিল্পচর্চায় ত এর দ্বারা কোনও ব্যাঘাত ঘটছে না, এতেই আমি খুশি।

যে-ক'টা বছর তার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কাটাই, তারই মধ্যে তাকে আমি অতি দ্রুত এক পরিণত শিল্পী হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। যা দিয়ে একজন সত্যিকারের প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পীকে চেনা যায়, সেই লক্ষণগুলি ইতিমধ্যেই অতি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছিল তার কাজে। আমি বুঝতে পারছিলাম, শিল্পকলার জগতে শ্রেষ্ঠ এক বহুমুখী প্রতিভা হিসাবে হঠাৎই সে বিখ্যাত হয়ে উঠবে। তার আর দেরিও বিশেষ নেই। সাগ্রহে সেই দিনটির জন্যে অপেক্ষা করছিলাম আমি।

কিন্তু আমি ভুল করেছিলাম। ভীষণ ভুল করেছিলাম। হঠাৎই এমন একটা ঘটনা ঘটে যায়, যা ঘটবে বলে আগে বুঝতে পারিনি। পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যাই আমরা। এমন একটা জায়গায় সে চলে যায়, খ্যাতি, শিল্প, এমনকী আমাদের এই চেনা জগতের সঙ্গেও যার ব্যবধান অতি দুস্তর।

ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল নিছক ঠাট্টাতামাশার ভিতর দিয়ে। সন্ধের দিকে প্রায়ই তার ফ্ল্যাটে আমি আড্ডা দিতে যেতাম। বছর দশেক আগে জানুয়ারির এক সন্ধেয় সেইরকম আড্ডা দিতে গিয়েছি। মায়োপিয়ায়

boiRboi.net

ভুগত বলে সন্ধের দিকে সে ছবি আঁকার কাজ বড়-একটা করত না। সেদিন কিন্তু সে বেশ বড় একটা ক্যানভাসে খুব বিভোর হয়ে রং ধরাচ্ছিল। কাজটা এতই তন্ময় হয়ে করছিল যে, আমি যে ঘরে ঢুকেছি. তাও সে টের পায়নি। কৌতূহলী হয়ে আমি ইজেলটাকে দেখব বলে তার পিছনে গিয়ে দাঁড়াই। ক্যানভাসে যা তাকে আঁকতে দেখি, তাতে আমার কৌতূহল আরও বেড়েই গেল। পৃথুলা, লাস্যময়ী একটি নারীমূর্তি, এমনভাবে আমার বন্ধুটি তাকে এঁকে চলেছে যে, রেনোয়ার ছবির কথা মনে পড়ে যায়। মনে হচ্ছিল, সে যেন তার সমস্ত কামনা ওই ছবির মধ্যে উজাড় করে দিচ্ছে। গলাটাকে খাঁকরে নিয়ে জিজ্ঞেস করি, ছবিতে যাঁকে লীলায়িত ভঙ্গিমায় দেখা যাচ্ছে, তিনি কে। এ কি তার কল্পনার নারী, নাকি বাস্তব ? আমার দিকে চোখ ফিরিয়ে সে হাসল। ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি। কথা বলে যা বোঝানো যেত, ওই হাসি থেকে

তার চেয়ে অনেক বেশি বুঝে নেওয়া গেল।

একটু চাপাচাপি করতেই বেরিয়ে পড়ল আসল কথাটা। আমার বন্ধুটি যে প্রেমে পড়তে পারে, আগে তা ভাবিনি। না-ভাবাটা ভুল হয়েছিল। মহিলাটিকে প্রথমবার দেখেই সে যে টলে গিয়েছিল, সেটা বোঝা গেল। এও বুঝলাম যে, নিজেকে সামলে নেবার কোনও চেষ্টাই সে করেনি, ফলে তাকে এখন হাবুডুবু খেতে হচ্ছে। সবটা শুনে প্রথমে বেশ মজাই লেগেছিল আমার। তাকে সে-কথা বললামও। আসলে, তখনও আমি ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না যে, ছেলে ধরাই যে-সব মেয়ের স্বভাব, আমার এই বন্ধুটি শেষ পর্যন্ত তাদেরই একজনের খপ্পরে পড়তে পারে। কিন্তু তা-ই ঘটে গেল।

আসলে যা ঘটল, তা আরও অনেক বেশি মারাত্মক। সত্যি বলতে কী, ব্যাপারটা যে এতখানি গড়াবে, তা আমি ভাবতে পারিনি।

হপ্তাখানেক বাদে আমার বন্ধুটির কাছ থেকে একখানা চিঠি পাই। তাড়াহুড়ো করে লেখা চিঠি। তাতে সে জানাচ্ছে যে, আগের দিন তাদের বিয়ে হয়ে গেছে, এখন তারা চলে যাচ্ছে অখ্যাত এক দ্বীপে। তবে সেখান থেকে সে আমাকে চিঠি লিখবে।

সে-সব চিঠিপত্র কখনও পাইনি। তার বদলে হঠাৎই একদিন এমন একটা খবর আমার চোখে পড়ে যে, আমি চমকে যাই। মৃত্যুর খবর। বন্ধুপত্নী মারা গেছেন। "সাঁতার কাটতে গিয়ে তিনি মারা যান।"

খবর পড়ে ভাবতে থাকি যে, আমার বন্ধুটি এখন কী করছে। কী হল তার ? ভেবে-ভেবে কূল পাই না। এই একটা বদ্ধমূল বিশ্বাস আমার ছিল যে, সুবুদ্ধির উদয় হলেই সে আবার ফিরে আসবে। কিন্তু বছরের পর বছর যায়, সে আর ফেরে না। আমিও ফের শিল্প নিয়ে পড়াশুনা করতে লেগে যাই। তবে কিনা একেবারেই একা-একা।

এত দিন বাদে সেই মানুষটি আবার ঘরে ফিরেছে। বিষণ্ণ, গম্ভীর, শীর্ণ একটি মানুষ। এ যেন সেই মানুষ নয়, তার প্রেতমূর্তি। স্ত্রীকে সে যে এত গভীরভাবে ভালবাসত, তার মৃত্যুতে যে সে এত শোকাবহভাবে পালটে যাবে, তা ত আমি ভাবতেও পারিনি।

বন্ধুটি তার চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছে, আর আমি তাকে দেখছি। আগে সে কত উচ্ছল, কত প্রাণবন্ত ছিল। আর আজ ? সেই উচ্ছলতা, সেই টগবগে স্ফূর্তির ভাবটাকেই কে যেন তার ভিতর থেকে নিংড়ে বার করে নিয়েছে। বন্ধুটির বয়েস ত পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না। অথচ তাকে দেখাচ্ছে যেন এমন এক প্রৌঢ়ের মতো, যার শরীর-স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে।

এই অবস্থায় কথাবার্তা শুরু করা খুবই শক্ত ব্যাপার। তবু আমাকেই সেটা শুরু করতে হল। জিজ্ঞেস করলাম, কবে সে ফিরেছে।

"আজই সকালে।" কথার মধ্যে প্রাণের কোনও স্পর্শ নেই।

কোথায় উঠেছে ? তার সেই আগের ফ্ল্যাটে ?

এবারও সে একই রকমের নিষ্প্রাণ গলায় বলল, "না।"

আরও কিছু প্রশ্ন করে যা জানা গেল, তা এই যে, তার অবস্থা মোটেই সুবিধের নয়। টাকাপয়সা কিচ্ছু নেই। যেটুকু যা ছিল, ফেরার ভাড়া জোগাড় করতেই তা ফতুর হয়ে গেছে। সারা দিনে তার পেটে কিছু পড়েনি। এখানে তার কোনও আশ্রয়ও নেই। রাতটা যে কোথায় কাটাবে, তাও সে জানে না।

তাকে আমি আমার ফ্ল্যাটে এনে তুললাম। একদিন যে ছিল আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, এটুকু ত তার জন্যে করতেই হবে।

কিন্তু তার পরেও তার কোনও পরিবর্তন হল না। পথের মধ্যে হঠাৎ যখন দেখা হয়, তখন যেমন দেখেছিলাম, সেই রকমই রয়ে গেল সে। চুপচাপ কী যেন ভাবে। প্রাণের কোনও সাড়া মেলে না। ঘুমোয় কম, খায় আরও কম, কথাও বিশেষ বলে না। অথচ আমি ত তাকে সেই আগের মতো স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে চাই। ফেরানো যাতে সম্ভব হয়, তারই জন্যে যা-কিছু শিল্পসামগ্রী এতদিন ধরে একটি-একটি করে আমি জোগাড় করেছি, তার সব কিছু তার সামনে সাজিয়ে ধরি আমি। ভাবি, এ-সব দেখলে হয়তো তার শিল্পী-মন আবার জেগে উঠবে। কিন্তু কোথায় কী, শিল্পের নাম শোনামাত্র এমন বিরক্তিভরে সে ফিরিয়ে নেয় তার মুখ যে, আমি হাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হই। ভাবি যে, আস্তে-আস্তে সে সেরে উঠবে, এখন চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

এরই মধ্যে একটা সুযোগ এসে যায়। তাতে মনে হয় যে, তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার একটা শেষ চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। শিল্প নিয়ে ইতিমধ্যে আর মাথা ঘামাতে পারিনি, লাইব্রেরিতে খুব কাজের চাপ যাচ্ছিল, তবু এই সময়ে হঠাৎই একদিন একটা পোস্টারের উপরে চোখ পড়তে আমার সেই পুরনো ভাবনাটা আবার চাগাড় দিয়ে ওঠে। গ্যালারির কর্তৃপক্ষ, তাঁদের ঐতিহ্য অনুযায়ী ফরাসি চিত্রকলার এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন, সেখানে সেজান ও তাঁর পরবর্তী শিল্পীদের ছবি দেখানো হবে।

পোস্টারটা দেখেই পুরনো দিনের কথা আমার মনে পড়ে গেল। সেই সব দিনের কথা, যখন গ্যালারির দেওয়ালে টাঙানো বিখ্যাত সব ছবির দিকে আমরা দুই বন্ধু মিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতাম। বন্ধুটি আমাকে ছেড়ে যাওয়ার পরেও একা আমি ফি বছর তাদের প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছি। তবে কিনা, সে যখন সঙ্গে থাকত, আমার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে সেও কিছু মন্তব্য করত, সেই সময়কার আনন্দই ছিল আলাদা রকমের। পরে একা-একা গিয়ে আর তেমন আনন্দ পাইনি।

ফ্ল্যাটে ফিরে দেখলাম, শূন্য চোখে ঘরের সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে একটা ইজিচেয়ারে চুপ করে সে বসে আছে। পা দুটি সামনে ছড়ানো, দু হাত দু দিকে ঝুলছে।

বেশি কথার মধ্যে না-গিয়ে তাকে প্রদর্শনীর খবর দিলাম।

বললাম, "গ্যালারি তো আবার সবাইকে মাতিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছে হে!"

ভেবেছিলাম অন্তত এই কথাটা শুনে তার ভাবান্তর হবে। কিন্তু হল

না।

"কী বললে ?" সেই একই রকমের শূন্য চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল।

গোটা ব্যাপারটা অতএব খুলে বলতে হল।

"গ্যালারিতে প্রদর্শনী হচ্ছে। উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের ফরাসি চিত্রকলা। বিস্তারিত জানতে চাও তো...আরে, ফি বছরই ত ওরা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে, তোমার মনে নেই ?"

"প্রদর্শনী ?" সন্দিগ্ধ, দ্বিধাজড়িত গলায় সে জিজ্ঞেস করল। দৃষ্টিতে সুদূরের ছোঁয়া লেগেছে। যেন সে মনে করতে চাইছে পুরনো দিনের কথা।

ব্যাপার কী ? সব কিছুই সে কি ভুলে গেছে ? এ যে অবিশ্বাস্য। তাকে সে-কথা আমি বললামও।

"বাঃ, গ্যালারিতে সেই যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা ছবি দেখে কাটাতাম...কত আনন্দ, কত উত্তেজনা...সে-সব কিচ্ছু তোমার মনে নেই ? সব ভুলে মেরে দিয়েছ ? আর তা-ই আমাকে বিশ্বাস করতে হবে ? আরে, মাতিসের সেই বিখ্যাত ছবি ওদালিস্ক, যা দেখে কী উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলে তুমি, তাও মনে করতে পারছ না ?"

তবুও সে কিছু বলছে না দেখে এমনভাবে আমার সিদ্ধান্তটা আমি জানিয়ে দিলাম যে, এর আর কোনও নড়চড় হবার নয়। বললাম, "যা-ই হোক, কাল বিকেলে আমার সঙ্গে তুমি এই প্রদর্শনীতে যাচ্ছ। তখন বিশেষ ভিড়ভাট্টা থাকবে না।"

স্যুরার একখানা দুর্দান্ত ছবির সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। যে-রকম সূক্ষ্ম, প্রায় বৈজ্ঞানিক, পরিমিতিবোধের পরিচয় রয়েছে এই ছবিখানার বর্ণ-সংগতির মধ্যে, তাতে সংগীতের সূক্ষ্ম সুর-সংগতির কথাই আমার মনে পড়ে যাচ্ছিল। আমার চারদিকে বিখ্যাত সব ছবি। এত তন্ময় হয়ে, এত বিভোর হয়ে সেই সব ছবি আমি দেখছিলাম যে, বন্ধুটির কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম আমি। কী অপরূপ সব ছবি,—আমার মুখ দিয়ে কোনও কথাই সরছিল না।

সেজানের একখানা দারুণ ছবির উপরে চোখ পড়তে অবশ্য নিজেকে আর সামলানো গেল না। উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি ছবিখানির প্রশংসা করতে শুরু করে দিই।

কতক্ষণ ধরে প্রশংসা করছিলাম, কিচ্ছু আমার মনে নেই। কিন্তু হঠাৎই আমার খেয়াল হল যে, হল-এ ঢুকবার পর থেকে আমার বন্ধু এতক্ষণের মধ্যে একটিও কথা বলেনি। তার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম

আমি। ঘুরে দাঁড়িয়ে তার মুখে যে অভিব্যক্তি দেখলাম, তাতে আমার বাক্যস্রোত একেবারে সঙ্গে-সঙ্গেই বন্ধ হয়ে গেল।

বন্ধুর যে চেহারা আমার চোখে পড়ল, তেমন করুণ চেহারা আর কখনও আমি দেখিনি। এত ফ্যাকাশে, এত নিষ্প্রাণ দেখাচ্ছিল তাকে যে, আমার ভয় হল, যে-কোনও মুহূর্তে সে হয়তো মূর্ছিত হয়ে পড়বে।

হাত ধরে আস্তে-আস্তে তাকে আমি গেটের কাছে নিয়ে এলাম। তারপর গেট পেরিয়ে রাস্তায়। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আকাশের কিউমুলাস মেঘের পুঞ্জে লেগেছে অপার্থিব কমলা রঙের ছোঁয়া। এতক্ষণ যে আমরা ওই হল-এর মধ্যে ছিলাম, তা আমি বুঝতেই পারিনি।

"তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ ?" জিজ্ঞেস করলাম, "দেখে ত মোটেই ভাল ঠেকছে না ?"

ফিরে আসার পর এই প্রথম সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকাল সে।

তারপর বলল, "সব কথা তোমাকে খুলে বলাই ভাল।" কণ্ঠস্বর গম্ভীর, তাতে এমন একটা দ্যোতনাও যেন রয়েছে, যা খুব শুভ নয়। "ভেবেছিলাম, কিছু না-বলে স্রেফ চুপ করে থাকব। কিন্তু এই কষ্ট আর

আমি সহ্য করতে পারছি না।"

একটুক্ষণ চুপ করে রইল সে। মস্ত বড় একটা নিশ্বাস নিল। তারপর বলল, "তুমি হয়তো ভাবছ যে, স্ত্রী মারা যাওয়াতেই এইভাবে বদলে গিয়েছি আমি। কিন্তু না, তা নয়।...সে ছিল অতি নচ্ছার মেয়ে!...না না, তার মৃত্যুর সঙ্গে আমার এই বদলে যাওয়ার কোনও সম্পর্ক নেই। সে যে মরেছে, তাতে বরং আমি হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি। আসলে তার পরে একটা ব্যাপার ঘটে....।"

আবার একটুক্ষণ চুপ করে রইল সে। মনে হল, যা সে বলতে চায়, তা সে সহজে বলতে পারছে না, বলতে তার খুব কষ্ট হচ্ছে।

"তার মৃত্যুর পরে একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার মনে হল, অদ্ভুত এক পৃথিবীর দিকে আমি তাকিয়ে আছি। চারপাশে যা-কিছু দেখছি, তার সবই কেমন যেন অদ্ভুত ছাতা-পড়া। বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে আমি আয়নার সামনে দাঁড়াই। মুখখানা কেমন যেন ফ্যাকাশে লাগল। মনে হল, আমার মুখ থেকে সমস্ত রক্ত কেউ শুষে নিয়েছে।

"মারাত্মক ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল, আমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তক্ষুনি এক চোখের ডাক্তারের কাছে আমি ছুটে যাই।

"ডাক্তার আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করলেন, চোখ দেখলেন, নানা রকম প্রশ্নও করলেন। তারপর কী বললেন ভাবতে পারো? বললেন যে, না, আমি অন্ধ হয়ে যাচ্ছি না...না না, এটা অত খারাপ কিছু নয়। তবে হ্যাঁ, আমি বর্ণান্ধ হয়ে যাচ্ছি বটে!...ভেবে দ্যাখো! ব্যাপারটা একবার ভেবে দ্যাখো!...রংই তো আমার ভাষা, আর সেই আমি কিনা বর্ণান্ধ হতে চলেছি!...

"কী ভাবছ তুমি? ভাবছ আমি দুর্বল! ভাবছ যে, ভাগ্যের চাকার তলায় সেই জন্যেই আমি গুঁড়িয়ে গেছি! নিজের কথা বলতে পারি, আমি যে আত্মহত্যা করিনি কেন, এই কথা ভেবেই আমি অবাক হয়ে যাই। কারণটা হয়তো এই যে, বাঁচতে আমার ভারী ভাল লাগে, আর নয়তো আমি ভিতু, কাপুরুষ। হয়তো সেটাই সত্যি কথা। নইলে দ্যাখো আজ আমার কাছে জীবনের কী অর্থ? শিল্পের কী অর্থ? যে লোক ধূসর ছাড়া...হরেক রকমের একঘেয়ে ধূসর ছাড়া আর কোনও রংই দেখতে পায় না, সেজান মাতিস আর রেনোয়ার ছবিরই বা তার কাছে কী অর্থ?"